ডাকবাংলো

পূর্ণেন্দু মান্ডী

"গল্পটি সাঁওতালি ভাষায় 'হেলকাও' পত্রিকার ২০২৫ সালের মে সংখ্যার (খণ্ড ১০, ইস্যু ১) মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য এর অনুবাদ এখানে প্রদান করা হল। "

সকাল থেকে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। সবে জুন মাসের শুরু। গত কয়েক দিনের টানা গরমে, আমরা প্রায় হাপিয়ে পড়েছিলাম। তাই বৃষ্টির প্রতি আমাদের কোন অনুযোক নেই। সাগেন বলল ননাদা দেখেছো, বেগুনি কালারের কিউমুলাস নিম্বাস মেঘগুলো একদম ছাতার মত বুরুডি গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। আর ওই কালো মেঘের বুক চিরে নেমে আসছে অবিরাম বৃষ্টি। এই অপরূপ দৃশ্য দেখে, আমার ছোটবেলায় পড়া রবিবাবুর কবিতার কথা মনে পড়ে গেল!

নরেন বলল তাহলে আর দেরি কেন সগেন, পাঠ কর। অনেকদিন হলো কোন পদ্যই পাঠ করনি। সাগেনের কন্ঠস্বর, এই অদ্ভুত অপরূপ অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর রবি ঠাকুরের ছন্দে, আমাদের ক্লাব ঘরে তখন জলসার পরিবেশ।

এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো নরেন দরজা খুলে বলল আরে এসো ভায়া এসো।
ননাদা তার মোটা গোঁফের নিচে একটু মুচকি হেসে বলল, এই না হলে আড্ডাবাজ! বুরুডির এখনো এতটাও খারাপ অবস্থা হয়নি, যে আমাদের ক্লাব ঘর বন্ধ করে রাখতে হবে। কি বল সাগেন?

সাগেন - মাথা নাড়িয়ে সাই দিল।
নরেন বলল - কি হে সিধু, তোমার সাথে অনি এলোনা?
[এখানে বলে রাখা ভালো অনি মানে অনির্বাণ ভট্টাচার্য যিনি আমাদের ক্লাবের একজন সম্মানীয় সদস্য। তবে ক্লাবের সবাই সুযোগ পেলেই অনিকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা আর আচ্ছা করে রগড় করতে ছাড়ে না।]
নরেন, শুধু একটু বাঁকা হাসি দিয়ে, মুখ ভেংচিয়ে বলল; না বাবুর কি জানি কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে।
ননাদা বলল, বল কিহে? আজ রবিবার অফিস ছুটি; তার ওপর অবিরাম বৃষ্টি পড়ছে। এত মনোরম পরিবেশে, গরম চপ আর চা খেতে খেতে আড্ডা মারার থেকে বড় কোন কাজ হতে পারে কি?
সিধু চারিদিকে তাকিয়ে ঠোটের উপর আঙুল রেখে চাপা গলায় বলল, আড্ডার থেকেও বড় কাজ আছে, দরজা জানলা বন্ধকরে কুম্ভকর্ণের মত সিতঘুম দেওয়া!
সেটা শোনা মাত্রই, সবাই উচ্চস্বরে হো হো করে হেঁসে উঠলো।

ঠিক এই সময়ে হিন্দুস্তানি ভৃত্য সতনাম যাদব ট্রেতে করে গরম চপ আর চা দিয়ে গেল। ঘড়িতে তখন প্রায় পৌনে ছটা। এরইমধ্যে পুরো বুরুডি অঞ্চলকে, যেন একটা ঘন কালো চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চল ফলে রাত নামে ঝুপ করে; তবে গ্রীষ্মের দিনে এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাও নামে না এখানে। এখানে জীবন বড় কঠিন। তবে সাহিত্যপ্রেমী মানুষেরা বুরুডি কে ঝাড়খণ্ডের রানী, সাহিত্য প্রেরণার রসের খনি বলে।

আসলে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ওয়াল্টার অ্যান্ড সন্স কোম্পানির বিভিন্ন পদে চাকরির সুবাদে এই দুর্ভেদ্য গন্ডগ্রামে এসে পৌঁছেছি। আর এখানে বসবাসরত স্থানীয় কিছু বাঙালি ও আমাদের কোম্পানির কিছু সদস্যদের নিয়ে আমাদের এই মারাংবুরু ক্লাব।

তাকিয়ে দেখি এই অল্প সময়ে পেল্লাই সাইজের চপটা শেষ করে, ননাদা চুরুটে আগুন দিতে দিতে বলল - আরে সবাই যে চুপ, কেউ নতুন কিছু বল। সাগেন বলল - আজকের যা, গা ছমছম আবহাওয়া তাতে

তোমাকেই তোমার অফুরন্ত অভিজ্ঞতার স্টক থেকে নতুন কিছু গল্প আমাদের শোনাতে হবে। নরেনও সাগেনের কথায় সাই দিয়ে বলল হ্যাঁ ননাদা শোনাতেই হবে।

শুধু সিধু একবার ব্যাঁকা হাসি হেসে বলল, কি আর করা যাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা যখন পেয়ে গেছো, অগত্যা তোমাকে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

আসলে সিধুর স্বভাবটাই ওইরকম; ননাদাকে যথেষ্ট ভক্তি, শ্রদ্ধা করে। তবে টিটকিরি করতে ছাড়ে না।

ননাদা চুরুটে একটা জোরে টান দিয়ে শুরু করলেন-

গল্প একটা শোনাবো, তবে ভেবো না সব বানিয়ে বলছি। না, এ আমার কথা নয়; আমার বড় ঠাকুরদার জীবনের ঘটনা। তিনি মস্ত সৌখিন পুরুষ ছিলেন। তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাক ও ছুঁচলো চোয়াল দেখে মানুষে তাকে সাহেব বলে ভুল করতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় সেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পৃষ্ঠ নিরীহ দরিদ্র মানুষদের তিনি অকাতরে দান ও সেবা প্রদান করেন। ফলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে, ব্রিটিশ সরকার তাঁর কাজে খুশি হয়ে পুরস্কার স্বরূপ বড় ঠাকুরদাকে "স্যার" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন। আমার বড় ঠাকুরদা আর আমার পিতামহের মধ্যে বয়সের পার্থক্য প্রায় ২৫ বছর। সালটা ১৯১০ যখন সারাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের ঝড় বইছে; তখন তিনি ব্যারিস্টারি পাস করে সবে লন্ডন থেকে ফিরেছেন।

আমাদের পৈতৃক ভিটা "শান্তিকুঞ্জ" হয়ে ওঠে বড়ঠাকুরদার বিশ্রামের একমাত্র কেন্দ্র। তিনি দিনগুলি খুব আনন্দের সাথেই অতিবাহিত করছিলেন। এমন সময় একদিন দুপুরের দিকে বাল্যবন্ধু জন স্কটিশের চিঠি এসে পৌঁছলো। বাল্যবন্ধু জন চিঠিতে লিখেছে,

গত দুদিন আগে সৌম্য বিলেত থেকে ফিরেছে, তার মুখে তোমার দেশে ফেরার খবর পেলাম। 27 শে মে আমার ছোট বোন লিডির বিয়ে

তোমাকে আসতেই হবে। তুমি জেনে খুশি হবে যে আমাদের পুরনো অনেক বন্ধুই বিয়েতে উপস্থিত থাকবে।
ইতি,
তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু,
জন

চিঠিটা উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে, তিনি বাল্যবন্ধু জনের সাথে কাটানো হোস্টেলের দিন গুলি স্মরণ করে হাসলেন। লন্ডনে যাওয়ার পরেও দুজনের মধ্যে দুএকবার চিটির আদানপ্রদান হয়েছে। তবে এর বেশি নয়। তিনি জীবনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন যে, লিখবো লিখবো করেও বন্ধু জনকে আর চিঠি লিখতে পারেননি। বড় ঠাকুর্দা তার ভাশেরন কনস্তান্তিনের পকেট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখেন ঘড়িতে তখন প্রায় দুপুর পৌনে একটা। এমন ভাবে যে আমন্ত্রণ আসবে, সেটা তিনি আশাও করেননি। তার লং ড্রাইভের নেশাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠেছে। তল্পিতল্পা গুটিয়ে সবকিছু গোছাতেই তার, অনেকটা সময় চলে গেল। প্রায় পৌনে দুটোর দিকে বড় ঠাকুরদা তার বিলেতি ডেমলার গাড়িটির উপর চড়ে বসলেন। যেতে হবে প্রায় একশো ক্রোশ পথ। তিনি একাকি লং ড্রাইভে যেতে খুব পছন্দ করতেন। তবে এইবার তার ব্যাতিক্রম হয়েছে। তার আদরের প্রায় ৮৫ কেজির যমদূতের মত রটওয়েলার কুকুরটিকে বড় ঠাকুর্দা সঙ্গে নিলেন।
তবে তিনি প্রায় বলতেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের প্রধান শর্তই হলো, একাকী ভ্রমণে যাওয়া।
তার বিলেতি গাড়িটা ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে, বর্ধমান মেদিনীপুর রোড ধরে। রাস্তার দুদিকে এক অপরূপ অযাচিত সৌন্দর্য বিরাজ করছে। তবে দুঃখের বিষয়, বড় ঠাকুরদার সময়ের, সেই জঙ্গল লালায়িত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখন আর নেই। মেছেদা পৌঁছে, বড় ঠাকুরদা তার পকেট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখেন, পৌনে চারটা বাজে। আরো যেতে হবে প্রায় ৩০ ক্রোশ পথ। তিনি গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির কার্বোরেটরের জল পাল্টে, ফ্লাক্স থেকে এক কাপ কফি ও একটি চুরুট নিঃশেষ করে, আবার গাড়িতে চড়ে বসলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ।

থমথমে পরিবেশ। কোথাও কোন জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দূরে একটি গ্রাম ও কিছু চাষের জমি নজরে পড়ল।
পুব আকাশে ছাতার মতো কালো মেঘ আস্তে আস্তে নীল আকাশকে গিলতে শুরু করেছে। দিনটা ছিল অস্বাভাবিক গুমোট। তমলুক হয়ে ময়নার বিখ্যাত ডোম বংশীয় রাজা লাউসেনের বিশালাকার ময়না গড় অতিক্রম করে, কিছুদূর গিয়ে দেখেন রাস্তার অবস্থা অতি করুন। পাঁচ বছর আগেও রাস্তাটি ছিল মাটির, তবে তার অবস্থা ছিল এখনের থেকে বহুগুণ গুণ ভালো। সম্ভবত কয়েক বছর আর মেরামত করা হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় মাটি সরে গিয়ে, ছোটখাটো ডোবার আকার ধারণ করেছে। ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীরা এই পথে ঘোড়াই টানা ফিটন গাড়ি নিয়ে গেলও, যন্ত্রচালিত চার চাকার বাহন নিয়ে যায়নি বললেই চলে।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বড় ঠাকুরদা গাড়ি চালানোই মনোনিবেশ করলেন। সন্ধ্যের অন্ধকার আস্তে করে আলোকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। রাস্তার দুই পাশের গাছপালা বন জঙ্গল প্রবল বেগে পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে।
যেন এই নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার জাদু ছড়ির একটানে এক অলৌকিক স্বপ্নের জাল বুনছে আর রেক্স নন্দনতত্ত্ববিদ গণের মত তার নিজের ভাষায় শব্দ করে কদাচিৎ ভাব প্রকাশ করছে যেন বলতে চাইছে, ধন্য হে স্নেহময়ী মায়াভরা স্রষ্টা, তুমি ধন্য, ধন্য তোমার সৃষ্টি।

বড় ঠাকুরদা ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে এগোচ্ছিলেন। সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে। চারিদিকে নিরবতা, শুধু মাঝে মাঝে অদ্ভুত এক ধরনের পাখির ডাক কানে ভেসে আসছিল। যা তাকে একটু অস্বস্তিতে ফেলেছে। আকাশটা ভারী হয়ে আসছে যেন কোন ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে। বড় ঠাকুরদা তার পকেট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখেন সময় প্রায় সাড়ে সাতটা।
ময়না রাজবাড়ি অতিক্রমের দীর্ঘক্ষণ পরে এই প্রথম একটি সাহেবি বাংলো নজরে পড়ল। ক্লান্ত পথিকদের এই বাড়িটিই জানান দেয় ডাকবাংলো আর দেরি নেই। এই ডাক বাংলোকে কেন্দ্র করে গুটিকতক

এংলো ইন্ডিয়ান পরিবার বসতি স্থাপন করেছে। তবে এই বাড়িটির জীর্ণ দশা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় বাড়িটি কিছুকাল হলো পরিত্যক্ত। আগাছা আস্তে আস্তে বাড়ি ও তার সংলগ্ন জায়গা গুলিকে গ্রাস করা শুরু করেছে।

বড় ঠাকুরদা আস্তে আস্তে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন। গাড়ির হেডলাইটের আলো, অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দুপাশের শাল সেগুন গাছগুলি প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে আর যেন ফেল ফেল করে তাদের দেখছে।

তবে বড় ঠাকুরদা এবার একটু অবাক হয়ে দেখলেন, এখানেও কয়েকটি নিঃসঙ্গ একাকী বাংলো নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বিন্দুমাত্র প্রাণের আভাসটুকুও নেই। তিনি গাড়ি থামিয়ে চারিদিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখলেন; একটা প্রশ্ন বারবার বড় ঠাকুরদাকে বিচলিত করতে লাগলো। এই জন মানবহীন পরিত্যক্ত বাড়িটির পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ কি?

স্মৃতির পাতায় পাঁচ বছর আগের দৃশ্য ভেসে উঠলো যখন এই বাড়িটার সামনে জীবন ছিল আলো ছিল। রেক্সও গাড়ির ভেতর থেকে অস্বাভাবিক কর্কশ গলায় গর্জন করতে শুরু করেছে। রেক্সের এই গর্জনটি বড় ঠাকুরদা ভালো করেই চেনেন। যেকোন বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে রেক্স এভাবেই কর্কশ গলায় গর্জন শুরু করে। গুজরাটের গির অরণ্যে সিংহ শিকারের সময়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বড় ঠাকুরদা তার প্রিয় .375 H&H Magnum রাইফেলটিকে তার সাইড সিটে প্রস্তুত করে রাখলেন যাতে যে কোন রকম পরিস্থিতি তিনি অতিসহজেই সামাল দিতে পারেন।

আকাশ কালো মেঘে পূর্ণ। সমস্ত আকাশ থেকে আলোর কনা পর্যন্ত মুছে ফেলা হয়েছে। আবহাওয়া খুবই গুমোট, তবে গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে বাতাস এসে গায়ে লাগছে। দূরে ডাক বাংলোর স্ট্রিট লাইটটা নজরে পড়ল। ল্যাম্পপোস্টের অবস্থাও অনেকটা পরিতক্ত বাড়ি গুলির মতই শীর্ণ। যেন দীর্ঘ গ্লানি আর ক্ষোভের ভারে ক্লান্ত।

তবে ল্যাম্পপোস্ট দেখেই বড় ঠাকুরদা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। আর কিছুক্ষণ বাদেয় বড় রাস্তা। তারপর গন্তব্যে পৌঁছাতে লাগবে মাত্র ১ ঘন্টা।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি এসে বড় ঠাকুরদার গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। তার ভুরু কুঁচকে উঠল—গাড়ির তো এমন হওয়ার কথা নয়। ইঞ্জিনের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, চারপাশের নীরবতার একটা অদ্ভুত চাপা সুর বেজে উঠল। ঠাকুরদা দ্রুত বনেট খুলে ইঞ্জিন দেখতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই অস্বাভাবিক মনে হলো না।



ঠিক তখনই, তার চোখ গেল সামনে—দূরের একটি বাংলো বাড়ির দিকে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশু। বয়স ছয়-সাত বছর হবে। তারা একে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। বড় ঠাকুরদার মনে হলো যেন তার অবস্থা দেখে মজা পাচ্ছে। কিন্তু শিশুদুটোর মুখগুলো কেমন যেন অদ্ভুত! ফ্যাকাশে, যেন প্রাণশক্তিহীন। তাদের কঠোরাগত চোখদুটি বড় বড় আর চকচকে, আর মুখের হাসিটাও অস্বাভাবিক।

"এই, তোমরা এখানে কী করছো? অত রাতে?" বড় ঠাকুরদা কৌতূহল নিয়ে প্রশ্ন করলেন।

শিশুদের মধ্যে মেয়েটি, কানের কাছে ফিসফিস করে কিছু বলল ছেলেটিকে। ছেলেটি এবার ঠাকুরদার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসির মধ্যে কেমন একটা শীতলতা ছিল, যেন সেখানে আনন্দ নেই—শুধু ঠাট্টা।
এদিকে গাড়ির ভেতর থেকে অস্বাভাবিক গর গর শব্দ করতে শুরু করল রেক্স। বড় ঠাকুরদা রেক্সকে ধমক দিয়ে চুপ করালেন।

বড় ঠাকুরদার কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, “তোমাদের বাবা-মা কোথায়? তারা কি আমাকে সাহায্য করতে পারে? আমার গাড়িটির কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে!”

ছেলেটা একটু মাথা ঝাঁকালো, কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

চারপাশের পরিবেশটা যেন হঠাৎই অনেক ভারী হয়ে উঠল। ঝিঁঝির ডাক থেমে গেছে, বাতাসে এক অদ্ভুত কাঁচা গন্ধ ভেসে আসছে। বড় ঠাকুরদার মনে হল এই গন্ধটা তিনি আগেও কোথাও পেয়েছেন, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেন না।

তিনি পেছনে তাকালেন, চারদিকে কোনো আলো নেই, শুধু সামনের ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলোতে বাচ্চাগুলোর ফ্যাকাশে মুখগুলো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

বড় ঠাকুরদা দ্রুত ফিরে গেলেন গাড়ির কাছে, কিন্তু গাড়ি এবারও স্টার্ট হোলনা। ভেতরে একটা শীতল অনুভূতি ঢুকে গেল। তিনি আবার বনেট খুলতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পেছন থেকে বাচ্চা দুটির কন্ঠ ভেসে এলো, “আপনি কি সাহায্য চান? আমাদের বাড়িতে চলুন, বাবা অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন।

এবার বড় ঠাকুরদার মনে একটা ক্ষীণ আশা দেখাদিল; তিন বললেন, অনুগ্রহ করে তোমাদের বাবাকে একটু ডেকে দেবে?

শিশুরা জানাল, "বাবা বাইরে গেছেন, ডাক্তার বাবুকে আনতে, মা অসুস্থ। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা ফিরে আসবেন। আপনি আমাদের সঙ্গে বাড়িতে আসুন, মা বাড়িতে আছেন।"

বড় ঠাকুরদা তাদের সাথে বাড়ির দিকে এগোলেন। শিশুরা তাকে ড্রয়িং রুমের মধ্যে দিয়ে একটা বেড রুমে নিয়ে গেল। রুমের ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন, তাদের মা, মিসেস ওয়াটসন, শয্যাশায়ী এবং বেশ অসুস্থ। তার মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, যেন দীর্ঘদিন ধরে অসুখের সাথে লড়ছেন। বড় ঠাকুরদাকে দেখে মিসেস ওয়াটসন কষ্টভরা একটি মৃদু হাসি উপহার দিলেন, যেন তার দুর্বলতাকে ছাপিয়ে সৌজন্য বজায় রাখতে চাইছেন। তার ভাঙা গলায় আস্তে করে বললেন, "আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন। আমার স্বামী ফিরে এলেই আমাদের ড্রাইভার আপনার গাড়ি সারিয়ে দেবে।"

বড় ঠাকুরদা অতিথি কক্ষে অনেকক্ষণ ওয়েট করছিলেন। গাড়ির শব্দ শুনে, তিনি জানালার খড়খড়ি সরিয়ে দেখেন, মিসেস ওয়াটসনের স্বামী, মিস্টার জর্জ ওয়াটসন ফিরেছেন। সঙ্গে ডাক্তারও আছে। মিস্টার ওয়াটসন মধ্যবয়সী, উঁচু লম্বা গড়ন, এবং গম্ভীর মুখশ্রী,ধূসর চুলগুলো এলোমেলো—একজন রুক্ষ মানুষ বলে মনে হয়। তার মুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট, যেন কাজের চাপে তার শরীর ও মন ভেঙ্গে পড়েছে।

বড় ঠাকুরদা রুম থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে যাবেন; এমন সময়, বাড়ির বাইরে থেকে কারও বীভৎস চিৎকার কানে ভেসে আসতেই ঠাকুরদার হৃদয়টা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিনি জানালার খড়খড়ি দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, গাড়ির সামনেই মিস্টার ওয়াটসনের দ্বিখণ্ডিত নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। ঠাকুরদা দ্রুত নিজের রাইফেল তুলে নিলেন এবং ছুটে গেলেন মিসেস ওয়াটসনের রুমের দিকে। কিন্তু সেখানেও এক ভয়ানক

দৃশ্য অপেক্ষা করছিল—মিসেস ওয়াটসনের দেহ নিথর, মাথা শরীর থেকে আলাদা হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে, আর তার পাশে তার দুই সন্তানও নিথর ভাবে পড়ে আছে।
হঠাৎ বাতাসে কিসের একটা খসখস শব্দ শুনতে পেলেন বড় ঠাকুরদা। রুমের হালকা আলোতে এই বিভীষিকাময় দৃশ্য আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। মনে হল যেন বাড়িটা বহুদিন ধরে খালি পড়ে আছে।

এক মুহূর্তে তাঁর মন ঘুরে গেল। একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ তার নাকে আসতে শুরু করেছে, তবে এবার তিনি গন্ধটি চিনতে পেরেছেন। এটি নির্ঘাৎ চামড়া পচার গন্ধ! তার শিরদাঁড়া দিয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। তিনি দ্রুত বাড়িটি থেকে বেরোতে গেলেন; ঠিক তখনই চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেল।
হঠাৎ ঠাকুরদা অনুভব করলেন, তার গলায় ছোট ছোট হাতের অদৃশ্য স্পর্শ। সেই হাতগুলো এত শক্তিশালী ছিল যে তার শ্বাসরুদ্ধ হতে শুরু করল। চারপাশে বিকট খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তিনি চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুক্তি পেতে পারছিলেন না। সাড়াসির মত কঙ্কালসার হাতের চাপে তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে, তার প্রিয় কুকুর রেক্সের গর্জন শুনতে পেলেন। কুকুরটি প্রধান ফটকের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তার দিকে ছুটে এলো। বড় ঠাকুরদা আর কিছু মনে করতে পারেন না, শুধু এতটুকুই জানেন যে রেক্স তাকে টেনে-হিঁচড়ে গাড়ির দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেই রাতের বিভীষিকা থেকে বাঁচিয়েছিল।

পরদিন ভোরে, বড় ঠাকুরদার জ্ঞান ফিরল একটি গির্জায়। পাশে ফাদার থমাস এবং কিছু এংলো-ইন্ডিয়ান মানুষ জন দাঁড়িয়ে ছিল। ফাদার জানালেন, পাঁচ বছর আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই এলাকায় একদল ডাকাত এমন হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, যা আজও মানুষ ভুলতে পারেনি। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে, কালকের দিনেই ওয়াটসন পরিবারকে ঐ ডাকাতরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। সেই ভয়ানক

ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন ঠাকুরদার জীবনে ঘটে গেল, তবে তার রটওয়েলার কুকুরটির জন্যই তিনি বেঁচে ফিরেছিলেন।

++++++++++++++++++++++++++++++++++